কথাসাহিত্যের শামীম রেজা

খোরশেদ আলম

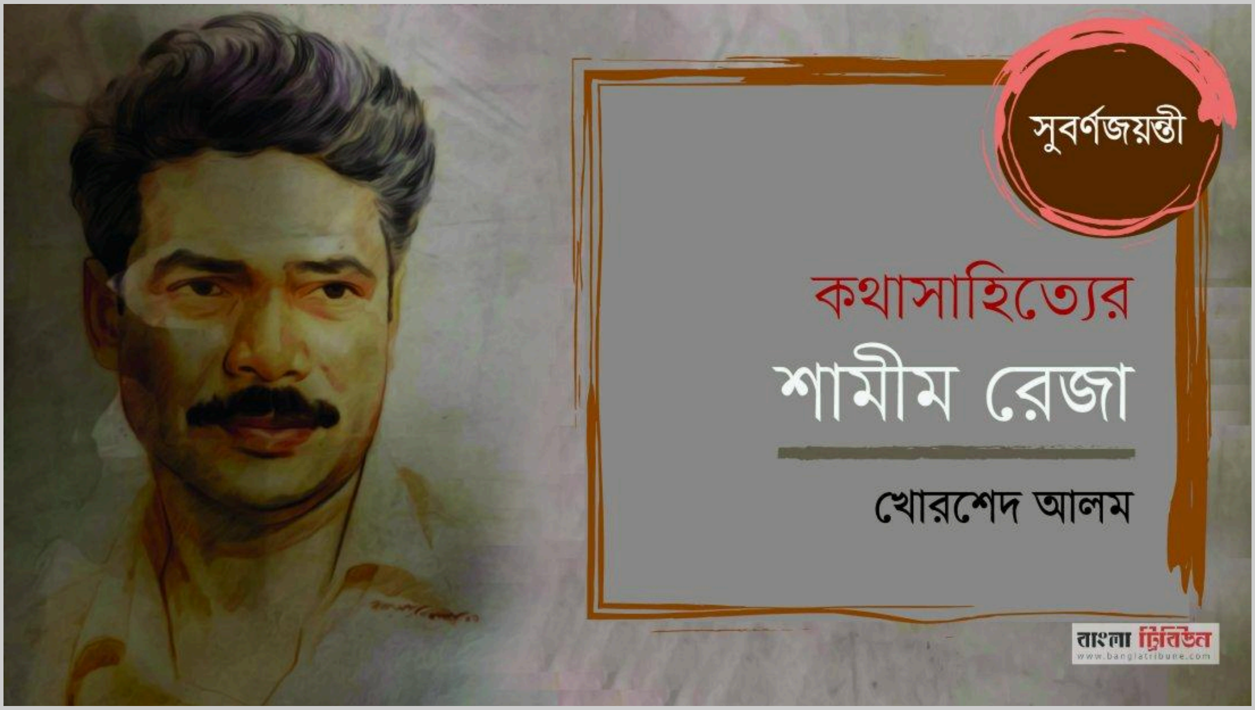

যে-কোনো কিছু সম্পর্কে জানা থাকলে লিখতে সময় লাগে না। কিন্তু শামীম রেজাকে নিয়ে তথা তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে লিখতে বেশ খানিকটা সময় নিলাম। তাঁর বই বার বার পড়েও ঠিক করতে পারছিলাম না আসলে কী লিখবো! প্রিয়জনকে নিয়ে লেখা আসলেই খুব দুষ্কর—এবার পলে পলে উপলব্ধি করলাম। যাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা হচ্ছে, সাহিত্য নিয়ে কথা হচ্ছে, আলাপে-আড্ডায় প্রবেশ করছি ভিন্ন কোথাও, ভিন্ন কোনো জগতে, অথচ লেখাটা হচ্ছে না। তাই এক সন্ধ্যায় আটঘাট বেঁধেই বসলাম। কবি শামীম রেজাকে কমবেশি সবাই জানেন। কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অনন্য শৈল্পিক প্রাণের পরিচয়টাও টের পেয়েছি—প্রথমে বই পড়ে নয়, বরং তাঁর সঙ্গে মিশেই। এরপর যখন 'ঋতুসংহারে জীবনানন্দ' বইটি হাতে

এলো, হাতে এলো আরেকটা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ‘ভারতবর্ষ’, তখন যেন তাঁকে আরো ভিন্নভাবে আবিষ্কার করতে পারলাম।

দেবেশ রায় থেকে হুমায়ূন আহমেদ, চাইকি মামুন হুসাইন, হোর্হে লুই বোর্হেস থেকে আলেহো কার্পেন্তিয়ের, ফকনার, কিংবা তলস্তয়-দস্তয়েভস্কি—কে নেই শামীম ভাইয়ের মগজের ঝুড়িতে? এগুলো তো টোকেন নাম মাত্র। পাশ্চাত্যের শিল্পকলা থেকে প্রাচ্যের কারুশিল্প এমন কোনো বিষয় নেই, যা তাঁর সঙ্গে আড্ডায় মুখর ওঠে না। তাঁর ইনস্টিটউট থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীরনগরের ডুপ্লেক্স কোয়ার্টার ছোয়া ঝিলপারের ছাতা-ছাউনি পর্যন্ত এর বিস্তার। আরেকজন ব্যক্তি সেখানে সর্বদাই জ্বলজ্বল করেন। তিনি কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হক। আমাদের আড্ডায় মহাভারত-রামায়ণ-ইলিয়াড-অডেসি-শাহনামা থেকে শুরু করে হাল আমলের রাজনীতি সবই থাকে। বুঝতে পারি, শামীম ভাইয়ের রয়েছে একটা গভীর অন্তকরণ। তার সঙ্গ পেলে একটা হার্দিক উষ্ণতা, একটা গভীরতা, ভালোবাসার অমোঘ টান, যা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে—এমন একটা অনুভবের দরজায় সবসময়ই তো পৌঁছে যাই। কিন্তু বড় বেশি আত্মকথন হয়ে যাচ্ছে। আসলে তো লিখতে বসেছি তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে।

একদিন শামীম ভাই বললেন, “পৃথিবীতে দু ধরনের গল্পলেখক থাকেন।”—কথাটা মনে দাগ কাটে। গল্পলেখক বলতে তিনি কথাসাহিত্যিক বুঝাতে চেয়েছেন। বললেন, একধরনের গল্পকার থাকেন যারা নিজের গল্পটা জানেন। আরেক ধরন হচ্ছে—গল্পটা তৈরি করে নেন। ‘শিশিরের শব্দ’ ওয়েবজিনে সাক্ষাৎকারে দেয়া তাঁর বক্তব্য সরাসরিই উদ্ধৃত করা যাক :

> “একধরনের লেখক বলেন যে, যে গল্পটা আমি লিখেছি সেটা আর কেউ লেখেনি।” সেই ধারনাটা হচ্ছে দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ দস্তয়েভস্কি কিংবা ফকনার কিংবা মার্কেজ পর্যন্ত। তাঁরা লেখেনও কম।
>
> তো এঁদের আরেকটা ঘরানা—যে-ঘরানাটা হচ্ছে, “আমি কোনো গল্পই জানি না, যা প্রতিদিন লিখি সেটাই গল্প হয়ে যায়। আখ্যান জানি না কিংবা গল্প জানি না।” এই ঘরানাটা সহজ, যেমন তলস্তয়, তারপর রবীন্দ্রনাথ কিংবা দেবেশ রায় নিজেও, কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।”

আসলে এই প্রথম ধারাটাই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। “ঋতু সংহারে জীবনানন্দ” গল্পের বইটা পড়তে পড়তেই কতকগুলো প্রশ্ন মনে আসে। সেসব নিয়ে বিস্তারিত কথাও হয় শামীম ভাইয়ের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার হিসেবে প্রথম পর্বটা ছাপানোও হলো। দ্বিতীয় পর্বটা এখনো হাতে আসেনি। যাই হোক, এরমধ্যেই এ-বইটার একটা মূল্যায়ন জরুরি। তাই গদ্য নিয়ে বসলাম। “ঋতুসংহারে জীবনানন্দ” পড়ে যা বুঝতে পারি, তা হলো শামীম রেজা কথাসাহিত্য নিয়ে ঠিক যা বলেছিলেন, তাঁর সেই চিন্তার ধরনটা গল্পগুলোর মধ্যে ধরে রেখেছেন। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু স্বাভাবিক। কারণ নব্বইয়ের দশকে তিনি গল্প লিখছেন। যখন সদ্য ধুনিয়ে উঠছে নতুন কলাকৌশলের দিকে অভিযাত্রা। তার চেয়েও বড় কথা, নতুন আঙ্গিকে কথা বলতে হবে। জেমস জয়েস তো সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই পড়ার চেষ্টা করেছেন। ততদিনে উইলিয়াম ফকনার কি কার্লোস ফুয়েন্তেস, তারাও পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যে জন্ম নিয়েছেন—দেবেশ রায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কি শহীদুল জহির। ফলে পথ কিন্তু দুরুহ, মত যা-ই হোক। দেবেশ রায়ই তাঁকে জীবদ্দশায় বলেছেন—ভিন্ন আঙ্গিকে শামীম রেজার এই গল্পগুলো লেখা। এরপর আর মূল্যায়ন-সমালোচনার পথে এগুনো কঠিন। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি “ভারতবর্ষ”টা সমাপ্ত হলে একটা দারুণ

উত্তর-ঔপনিবেশিক কন্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠবে। প্রত্যাশা রাখি—হয়তো সমাপ্ত হবে শীঘ্রই।

কথাসাহিত্য অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের মতোই নির্দিষ্ট বিষয় বা প্যাটার্নে রচিত হয়। শামীম ভাই মূলত কবি, তাই কবিতার আঙ্গিক তিনি নিজের মতো বদল করে নিয়েছেন। আমি যেটা বলি মেঘের মতো নতুন রঙ প্রাপ্তি। মেঘের কিংবা জলের যেমন নিজের কোনো রঙ থাকে না, আকাশ তাদেরকে রঙিন করে। নজরুল যেমন বলেন, “ভরে না তোমায় দেখে দেখে মন। আকাশের মতো বদলাও রঙ”—এটাই তো সাহিত্যের অনুভব। সসীম ভাষা নিয়েও অনুভবে যার অসীমত্ব ভাবিয়ে তোলে। তো সেই মেঘের আকার বদলের মতোই তিনি তাঁর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে রূপের বদল ঘটিয়েছেন। ফলে একেকটা গল্প হয়ে উঠেছে একেক প্রকৃতির। একটা দগদগে জীবন কিন্তু সেখানে বরাবরই উপস্থিত। তবু শুদ্ধমাত্র গল্প বা কাহিনি-কথনে তিনি নিবিষ্ট থাকেননি। এখানেই আসে আঙ্গিকের অভিনবত্ব। অর্থাৎ তিনি যে বলতে চান, তিনি গল্প বলেন না, ওটা কাঠামো মাত্র। গল্পের শরীরে থাকে এক চোরা কবিত্ব। কিন্তু কবিতার বালুচরেও কথাকে হারাতে দেন না। সেই কথাকে আবার ডুবো জাহাজের মতো ভিন্ন বন্দরে পৌঁছে দেন। এই ভ্রমণটা আসলে খুব জরুরি মনে করি। কথাসাহিত্য মানি যে, খুব জনপ্রিয় বিষয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জটাও তো কম নয়। সহজ-কঠিন উভয় ধরনের শৈলী, আঙ্গিকে লেখার মানুষও তো নেহায়েৎ কম নেই।

এবার দেখতে চাই কথা বা গল্প কীভাবে এগোয়। ‘সন্ধ্যা পাড়ের থৌল’ প্রথম গল্প। অভিজ্ঞতার একটা ফিল্টারে পরিস্রুত হয়ে এলো যেন শৈশব। সেটা আবার বর্তমানের সঙ্গে মিশে গেল। জেলখাটা ফাঁসির আসামিটা যখন সামনে উপস্থিত হয়, তখন অমনিশার একটা

কাল বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে যায়। অনেক লেখকই এই কথাটা উচ্চারণ করেছেন—যার শৈশব নেই, তার জীবন-পকেটে আসলে কিছু নেই। বস্তুত শৈশবটাকে শামীম রেজা পাচার করে দিয়েছেন একটা আধো-আলো বর্তমানের কাছে, এক জীবনের জটিল-অনুভবের কাছে।

“আজ রায়ে আমার ফাঁসির সময় নির্ধারণ হবে, ফাঁসির সেলেই অবস্থান করছি, এতদিন সেখানের একটা ফুটো দিয়ে কোনো আলোর পরিস্ফূটন হয় না বলে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কন্ডেম ভ্যানের ক্ষীণ আলোয় এই জ্যাম রাস্তায় আমরা দুইজন—আমি আর আমার ছায়া কথা বলছিলাম।”—এই ছায়াটাই হয়তো জীবন। এটা অতীতের সিঁড়ি বেয়ে মৃদু পায়ে হেঁটে আসে। কিন্তু হঠাতই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—এই তো মানবজীবন।

গল্পটার সময় ভাঙার মহিমা অসাধারণ। কারণ যখনই শুরু হোক, চৈত্র-সংক্রান্তির মেলার শেষ আলোয় গল্পটা শেষ করতে হবে। এই অনুবেদন দিয়েই কিন্তু শুরু। এরপর ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটা দুর্বল ঘোড়ার পিঠে শিশুসওয়ারি হয়ে গল্পের নায়ক পৌঁছে যায় দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ গ্রাম বাংলায়। এরপর যা হবার তা হলো। কিন্তু একটা জীবন ঘোড়দৌড়ের মাঠেই শেষ হয়ে যাবে? এমন জুয়াখেলা তো দস্তয়েভস্কির জীবনে ছিলো। এখানে জীবন শাসন করে সন্ধ্যাপাড়ের থৌল। সুচয়নার কুচক্রী বাবা এই চক্রের শেষ কুঠার, রাজনীতিবিদ, ভিলেজ পলিটিশিয়ান। তাই গল্পকারের ভাষ্যে নেমে এলো এক ঘনঘোর সংলাপ :

> “এই শেষ আলোটুকুই আমার শেষ ভাবনার সময় এরপর এমন এক ছায়ার প্রলাপ হয়তো আমার জীবনে আসলেও এই আলোটুকুর মতন

> এমন হীরণ্ময় দ্যুতি দু'চোখে আর দেখবো না, কী আশ্চর্য সব কথা বলছি তাই না।"

হ্যাঁ আশ্চর্য কথাই তো। সামান্য ২৭ টা কাঁচের মার্বেল হারানোর দুঃখ তো সেই কৈশোরে কম নয়। তাই, "তেমন সরল কান্না আর প্রচণ্ড দুর্দিনেও চেষ্টা করে কাঁদতে পারিনি।" কিন্তু এখন, "আমি চারদিন চাররাত ভাঙা গোরস্থানের মধ্যে কতগুলো হাড়ের সাথে সহবাস করছি।" স্মৃতিচারণা যেন এক প্রবল তাড়না হয়ে ওঠে। কারণ মানুষের কান্নার ইতিহাসের সঙ্গে দাদীমার কান্নার স্মৃতি তখন মর্মান্তিক আকার ধারণ করে আছে। শূন্য খাঁচাবিহীন পড়ে থাকা পাখির মতো তখন প্রপিতামহের ফসলের জমিন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাওয়া।

এরপর স্বপ্নে মতো ভেসে উঠবে মজা পুকুরে স্বর্ণের বাসনকোসন। প্রিয়তম বস্তুর ভোগেই তো ফিরে আসবে ঐতিহ্য। সেই প্রিয়তম বস্তু একটুকরা 'স্বর্ণের চান', শ্রুতিকাহিনির গর্ত খুঁড়ে তার দেখা মেলে না। যখন তা মানবিক পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে চায়, তখন জীবন শুকিয়ে শুষ্ক মরুভূমি হয়ে গেছে। তাই গল্পের নায়ক সন্ধ্যাপাড়ের থৌলের সেই ঘোড়সওয়ারি কিশোরটি জানতে চায় :

> "কেমন চলছে সুচয়নার বাবার পলিটিক্স—এখনো কি সন্ধ্যা নদীর পাড়ে থৌল কিংবা হালখাতার মেলা হয়; হলে আগের মতন কি আনন্দ উৎসবে মেতে থাকে গ্রাম! কারণ নব্য মিয়াদের অনেক টাকা আর টাকায় ফাঁসি বিক্রি হয় স্বাধীন বিচারে।"

জীবন দেখা হয় অন্য ভাবে, অন্য কোনো জোস্নালোক-শোভিত ভ্রমণপথে। সেই দেখার নাম—'জীবনানন্দ ও মায়াকোভস্কি জোছনা দেখতে চেয়েছিলেন'। নদীর জলসলাৎ শব্দ, নদী লোককথা, অলৌকিক পরিবেশ, অপ্রাকৃত অনুভব, দাঙ্গা-বাস্তব,

জীবন-আত্মহত্যা সব মিলেমিশে একাকার। সেগুন কাঠের খুঁটি এক অতিলৌকিক রহস্য তৈরি করে। কিন্তু “সেই খুঁটিটি আমরা স্পর্শ করে এসেছি, সমর খুঁটিটি জড়িয়ে ধরেছিল আবেগে, যেন জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন।” রূপসী বাংলার কবি এই খুঁটির গলা জড়িয়ে ‘রূপসী বাংলা’ আবৃত্তি করেছেন। তাই জান্তব মানুষের সঙ্গেই জীবনানন্দ পরিভ্রমণ করেন। অপরিচিত নক্ষত্রগুলো যখন তাদের ঘর পাল্টাচ্ছে, মেঘ তার আবরণ খুলে দিয়ে চাঁদকে স্তনসদৃশ করে তুলছে, তখন বরিশালের বগুড়া রোডের শিশুরা আকাশের দিকে তাকিয়ে লাল-নীল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এমনি অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট এক স্বপ্ন-পরিবেশে গল্প তৈরি হচ্ছে। এদিকে আকাশে তাকানোর কথা ভুলে যে-দৃশ্য দৃষ্টিগোচর তার প্রতিচ্ছবি :

> “মুগ্ধ মায়ায় অন্তর্বাসের হুক খোলার যে কামুক লীলাকীর্তন দেখেছি যা আমাদের অভিজ্ঞতায় একদম নতুন সংযোজন; ঐ রকম একজন বুড়োর কাছে।”

‘খুঁটি আবিষ্কারের কথকতা’ নামের এ-গল্পের ১মপর্ব প্রত্নতাত্ত্বিক এক খুঁটি আবিষ্কার করে। সেখানে জীবনানন্দ তার পূর্বপুরুষের হাত ধরে আবির্ভূত হন। ক্রমশ ধানসিঁড়ি, ধানসেদ্ধ, বিষখালি প্রভৃতি নদী বেয়ে নদীর পৌরাণিকতা জেগে ওঠে। শঙ্খঘোষ, ভূমেন্দ্র গুহ, সেবন্তীসহ আরো অনেকে সঙ্গী এই ভ্রমণে। বর্তমান লেখকেরা ডুবে যান এক অনায়াস কাহিনি-কথার সমুদ্রে। কেননা মহাদেবের জটার এক ভাঁজে গঙ্গা আর এক ভাঁজে লোককথার ধানসিঁড়ির উদ্ভব। এরপর গল্প এক বাঁক নিয়ে ধানসিঁড়ি পারের জীবনকথনে ব্যগ্র হয়। কে না জানে, সেখানে ইউনিসেফের ছাতু বন্ধ হয়েছে বলে কোনো এক মায়ের ছেলের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সে মাছ ধরার পেশা গ্রহণ করে। গল্প এক শ্রুতি-স্মৃতির মধ্য দিয়ে চলে যায় দাঙ্গা-হত্যাসহ মিডিয়ার ভূমিকাগ্রহণের কথায়। বিশ্বরাজনীতি,

রয়টারের খবর, বাবরি মসজিদ, রামমন্দির, আহমেদাবাদ, গুজরাট নানাস্থান পরিভ্রমণ করে তা উপনীত হয় বাগেরহাটের ইলেকশানে। মধ্যযুগের রাজনীতিও এসবকে হার মানায়। গল্পকারের ভাষ্যে—"সব রাজনীতি—আর খেলায় ধর্ম এক বড় অস্ত্র।"

এ-গল্পে একে একে সম্মুখিন হই মায়াকোভস্কি, তার প্রেমিকা নোরা কিংবা পোলনস্কায়ার। তলস্তয়ের আন্না কারেনিনা প্রসঙ্গ তাদের মাধ্যমেই এসে পড়ে। জোসনা আর জলের গভীর সমীকরণে ভ্রুনস্কি সেখানে ক্ষয়িত আলোকবিন্দু। জিততে জিততেও সে যেন পরাজয়ের গ্লানি বহন করে। অন্যদিকে "আন্না সমুদ্র জ্বরে ভাসতে ভাসতে একসময় হারিয়ে গেলো জোছনা দেখার খেয়ালে, জানি না আন্নাও জোছনা দেখতে চেয়েছিল কিনা?" এদিকে মায়াকো আর নোরার প্রেমকাহিনি এক নতুন দিকে মোড় নেয়। ইয়ানশিনকে ত্যাগ করা, মায়াকোর পাগলামী সমস্তটাই বিষণ্নতার ঘোর তৈরি করে। তবু যেন, "সমস্ত জীবন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে মোজার ভাঁজ পর্যন্ত হবে তাঁর নিরন্তর মনোযোগের বিষয়।" ইয়ানশিনকেই বা নোরা কীভাবে ভুলে যাবে? এরপর যা ঘটবার তা ঘটে যায়।

> "কার্পেটের উপর পড়ে আছেন মায়াকোভস্কি, হাত দুটো ছড়ানো, বাম বুকের ওপর ছোট্ট একটা রক্তের দাগ—আমি বারবার বাকহীন কণ্ঠে বলতে লাগলাম, কী করলেন আপনি… এমন করলেন কেন? এতদিন পর বুঝতে পারি, সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথাটা তোলার চেষ্টা করেছিলেন উনি, মনে হচ্ছে কি যেন বলতে চাইছেন উনি… তারপর তার মাথা ঢলে পড়লো, আস্তে আস্তে পাণ্ডুর হয়ে এল তার শরীর ও মুখের রঙ, অদ্ভূত জোছনায় ঠিকরানো স্থির আলো বের হচ্ছিল ওর খোলা চোখ দিয়ে…"

'শঙ্খলাগা' গল্পে জীবন বড় শক্ত, বড় নির্মম। যাদের জীবনে নিয়ত ভাগ্যের লুটোপুটি তারা তো আধামানব। চৌধুরী বাড়ির হিস্টিরিয়া

আক্রান্ত বউটি এদেশের সহস্র বঞ্চিত নারীর প্রতীক। ইটভাটায় কাজ করা মনুমাঝি, মেয়ে ময়ূরী সবই তো অনাদায়ী জীবনযন্ত্রণা। এরমধ্যেই জেগে থাকে পোড়োবাড়ির পরনকথা, অসুখের যন্ত্রণা, অলৌকিক পানি পড়া। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক শহরের আলো-আঁধারিতে যৌবন না ওঠা মেয়ের পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ়ের শিশ্নলেহন। এইতো শহর, এইতো বাস্তবতা, এখানেই শঙ্খলাগা জীবন। অথচ—"ঢাকা-ঢাকা পড়ে গেছে বিল্ডিংয়ে-বিল্ডিংয়ে, অথচ কত স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসেছিল তারা—দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে পারবে—সেসব স্বপ্ন ময়ূরীর জন্মের পূর্বেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে পুইন খোলার খাড়ালে মসৃণ মাটির প্রলেপে জড়ায়ে গেছে।" জীবন কি এরপর সহজাত সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হবে? না, হবে না। হাসনার হাসপাতালে থাকার সময় ময়ূরীর ওপর প্রচুর ধকল যায়। হাসনার বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে ময়ূরীর অবস্থান। হাসনা রাতের বেলায় দেখে এক অভাবিত দৃশ্য : "পুইনখোলার কাঁঠাল আর বরই গাছটা জড়াজড়ি করে লুটোপুটি খাচ্ছে!" সন্তান হবার পর নারী শরীরের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সত্যি কমে যায়। এ-দৃশ্যকে এক তীব্র মানস-বিভ্রমের ভাষায় আঁকেন গল্পকার। সেখানে চারটি পা চারটি গাছের ডালের উপমা হয়ে ঝড়ের গতি আর যৌনক্রিয়ার একটি মারাত্মক মুহূর্তকে তুলে ধরে। হাসনা সেখানে কেবল নির্বাকই হতে পারে, কারণ সে সরব হওয়ার অধিকারচ্যুত।

অস্তিত্ব-সঙ্কটের এক চরম নাম 'একটুকরা মাংসপিণ্ড ও ফ্রি ভিসা সমাচার'। এইতো আমাদের স্বদেশ, যেখানে একান্ত পানির দামে বিক্রি হয় মানবিক শ্রম, মর্যাদা। ফ্রয়েড কথিত অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই তো সামাজিক সমস্যা তৈরির মূল। আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে কাজ করা যুবকটার হাতপা ঠাণ্ডায় জমে যেতো। কে তা জানতো? মিথ্যা অপবাদ, জেলখাটা, পড়ন্ত বয়স্কা বুয়ার সঙ্গে যৌনমিলন সবই

একেকটি জটিল বাস্তবতা হয়ে ওঠে। মানবিক যন্ত্রণার নিদারুণ চিত্র, সেই সঙ্গে যৌন-তাড়নার বয়ান গল্পটিতে সাংঘাতিক অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করে। "ইস এই লিঙ্গ নিয়া কবিয়ালরা, পীরসাবরা কত কত কবিতা আর হজ্ব নসিয়ত করে। এটাই নাকি সকল কাম-কাইজের, সকল সৃষ্টির হোতা।" কিংবা লেখক যখন এক মেটামরফোসিস তৈরি করেন, "মাংসপিণ্ডটা যেন শিবলিঙ্গের নাহান দীর্ঘ। আস্তে আস্তে দীর্ঘ হচ্ছে"—এই কথনকৌশলে জান্তব এক মাংসচিত্র ভেসে ওঠে। অন্যদিকে মানবিক সম্ভাবনাও উবে যায় না। যখন সে উচ্চারণ করে :

"সে ভাবতে পারে না, মানুষ মানুষেরে খুন করে ক্যান? যে মানুষ তৈরি করা যায় না ইট, বালি, উরোপ্লেন, জাহাজের মতো, তারে ক্যামনে মাইরা ফ্যালায়।" অন্যদিকে ভিটেমাটি বিক্রির টাকায় বিদেশ যাওয়ার টাকাটা নষ্ট হলে ছেলেটি এক চরম দুঃস্বপ্নের মধ্যে পতিত হয়। সেখানেও সেই মাংসখণ্ডটা তার হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে লম্বা কালো সাপের মতো হয়ে ওঠে। বস্তুত এই সব মানসবিভ্রমের দারুণ রূপান্তর সৃষ্টি হয় গল্পটিতে, যা—স্বদেশের চিরাচরিত বাস্তবচিত্র আঁকার ভিন্নতর শিল্পকৌশল হয়ে ধরা দেয়।

'আমাদের সংবাদপত্রের ভূমিকা' গল্পেও এক মরুভূমি সদৃশ স্বদেশের বাস্তবতা উঠে আসে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি-সঞ্চালন ব্যর্থতায় গজিয়ে ওঠা বহুজাতিক কোম্পানির অনেক প্রসঙ্গ নানা গল্প জুড়ে রয়েছে। আর এ-গল্প এনজিও কার্যক্রমের ভয়াবহ সত্যের প্রকাশ। সেই সঙ্গে এ-গল্পে রয়েছে শহুরে ভিক্ষাবৃত্তির নির্মম নিরাবেগ চিত্র। এ-গল্পে প্রচুর সাদৃশ্য-উপমার আড়ালে জীবন-বর্ণিত হয়েছে। একটা সার্থক উপমাই কোনো রচনাকে শিল্প-উত্তীর্ণ করতে পারে। এরকম বহু উপমার দু একটি :

“বেশ্যার অর্থহীন শুষ্ক হাসির মতো ব্যবহার মান্নান বক্সের সঙ্গে এবাদুলের।”

“এখন সে মুখস্ত বলতে পারে মানব উন্নয়ন সংস্থা। সততাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। সবার উপরে মানুষ সত্য।”

“অন্যরা সময়ের অসুস্থ আয়নায় ফ্রেমবন্দি হয়ে পূর্বের কর্মচারীদের হাতেই রাত্রির নর্দমায় অভিষিক্ত হয়েছে।”

“এবাদের পাথর চোখের জ্যোতি জ্বলে—আবার কী-ভেবে নিভে যায়।”

বস্তুত কোনো সরল উপস্থাপন নয়। এক ব্যতিক্রমী ব্যঞ্জনা তৈরি করেন কথাকার। ব্যর্থ সংবাদপত্রের হলুদ সংবাদ মানবিক ধ্বংস নিয়ে আসে। সেখানে বলি হয় নিরপরাধ মানুষ। কেননা সমাজ-রাষ্ট্র তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

‘উপনিবেশী মন’ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার একটি গল্প। নৌকা বাইচের উৎসব দিয়ে গল্পের কাহিনি শুরু হলেও কথাকার এর নির্মম পরিণতি টেনেছেন। উপনিবেশের জটিল সময়কে শিল্পে নানা সময় নানামাত্রায় অঙ্কন করতে দেখেছি আমরা। শিল্পকলার প্রফেসর চরিত্রটির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজ ও মানুষের মনস্তত্ত্বের খবর পাই। গল্পের শুরুর দিকটা দেখে নেয়া যাক। একটা নষ্টালজিক পরিবেশ সেখানে বিদ্যমান। সেসঙ্গে রয়েছে বর্ণনাভঙ্গির অভিনবত্বও।

“মৃগয়া নদীর উজানভাঙা জলের অমন খোলা জায়গা থাকতে বড় বাড়ির পেছনের সান-বাঁধানো ঘাট, যেখানটায় মৃগয়া মৃগী রোগীর মতো খিঁচুনি দিয়ে দুর্বল বাঁকে পরিণত হয়ে দক্ষিণে সুধারামের চরে মিশেছে।”

চিত্রপ্রদর্শনী চলছে আন্তর্জাতিক উৎসবে। সেখানে বিভিন্ন দেশের পাশে বাংলাদেশেরও কয়েকটি ছবি পাঠানো হয়েছে। জুরিবোর্ডের সদস্যদের কাছে এসব ছবি তেমন কোনো দাগ কাটে না। তারা কোনোভাবেই বাংলাদেশে আঁকা ছবিগুলোকে মানে উন্নত বলে ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। কারণ ইউরোপে গত শতকেই এসব ছবির কৌশল শেষ হয়ে গেছে। প্রফেসরের বক্তব্যে—

> "কি আশ্চর্যের বিষয়! এখনকার শিল্পীরা মূলত ন্যুড ছবি আঁকার সৌন্দর্যই বোঝে না, বোঝে না রঙ ব্যবহারের সূক্ষ্মতা, তারা আসলে বিশ্রী রকমের অশ্লীল ছবি এঁকে এঁকেই মাকড়সার জাল বুনে চলেছে সুন্দরের চরের পতিত অনুর্বর বালুর জমিনে।"

প্যারিস থেকে আসা জাঁ ফ্রাসোর একটি ছবিতে চোখ গেঁথে যায় প্রফেসরের। যেন তাঁর চির চেনা প্রথম যৌবনে ছোঁয়া কোনো নারী প্রতিকৃতি। তিনি তাঁর ১৫ বছর বয়সী চেহারার দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ঘামতে থাকেন। এদিকে ভিয়েতনাম থেকে আসা 'ওয়ার' নামক ছবিটা যেন জেগে আছে ইতিহাসের কলঙ্ক নিয়ে। মেয়েটির ছিন্নভিন্ন লাশ তো কলঙ্কিত রাতে শতচ্ছিন্ন তারই দাদীর লাশ। অন্যদিকে নারী ফিগার-অঙ্কিত ছবিগুলো সাবরিনা নামক এক প্রেমিকার অবয়ব দিয়ে যেন তৈরি। প্রত্যেকটি ছবিই একেকটি জটিল স্মৃতিচারণ হয়ে ধরা দেয় তাঁর কাছে। মনে পড়ে ব্যক্তিক্ষয়ের হাজারো স্মৃতি। মনে পড়ে বাবার নির্লিপ্ততা, পরকীয়া করে মায়ের চলে যাওয়ার দৃশ্য। তারপর বাবার লাশ, সাবরিনার ছেড়ে চলে যাওয়া, অতীত গ্রামের সেই মৃগয়া নদীপাড়ের নয়নার পরিণতি—এসবই এক জটিল মনোদৈহিক পীড়ন হয়ে আসে। একটা ছবি দেখে তাঁর বিভ্রম হয়, যেন অবিকল সাবরিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পান, তিনি থোঁয়ারিতে ভাসছেন। সাবরিনা নয়, যেন সেই সাউদপুরার বড়বাড়ির মস্তিষ্ক-বিকৃত হয়ে যাওয়া নয়নাদি।

এ-সকল ভাবনা ছাপিয়ে আবার সাবরিনা ভেসে ওঠে। সাবরিনার কামার্ত নাভি তাঁকে আহ্বান জানায়।

> “সাবরিনার নাভির বামের কাটা অংশের পাশে এক ইঞ্চি ওপরের দু’টি হলুদাভ লোভ ক্রমশ অগ্নিবর্ণে রূপ নিয়ে চিতার কাঠে পরিণত হয়ে পয়েন্ট এইট লেন্সের কাঁচ ভেঙে চোখে ঢুকে পড়ে--;”

এরপরই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটে যায়। প্রফেসরের নিথর দেহ পড়ে থাকে বিশাল ক্যানভাসের ছবিটার পেছনে। একটি করুণ মানবিক পরিস্থিতির দারুণ চিত্র আঁকেন গল্পকার। যেন গল্প নয়, একটা তীব্র সংক্ষোভ, ক্ষয়িত চিত্তের প্রবল ভাঙচুর, ট্রাজিক পরিণতি। সবমিলে নিটোল শৈল্পিক নির্মাণ।

“ঋতুসংহারে জীবনানন্দ” পুরো গল্প গ্রন্থের ছটি গল্পই এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতির কৌশলে তৈরি। গল্পগুলোর মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি বৈচিত্র্য রয়েছে শিল্পনির্মাণের। লেখকের অতীত অভিজ্ঞতা এখানে কখনো সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে কীনা বোঝা মুশকিল। হয়তো তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে সরাসরি তেমন কিছু প্রকাশিত নয়। গল্প-কাহিনির একটা জটিল অবয়ব-সংস্থানে সবকিছুই নস্যাৎ হয়ে কেবল শিল্পটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানেই লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জানা অভিজ্ঞতাকে অজানার মোড়ক, চেনা জীবনকে অচেনার মোড়ক পড়িয়েছেন তিনি। এভাবেই গল্প হয়ে ওঠে নতুন অভিযাত্রার সমুদ্রসঙ্গী। গল্পকে তিনি আসলে তৈরি করেন।

কবির হাতে গল্প—তা তো কবিতার মতোই প্রহেলিকা কিংবা রহস্য। শামীম রেজার গল্পে জীবনের এই অনির্দেশ সম্ভাবনার প্রতি একটা গভীর আস্থা আছে। তিনি শুধু কাহিনি বুনন করেন না, গল্পের বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করে দেন ইতিহাস আর সমকালকে। কখনো

লৌকিক পুরাণ, পরনকথার বেলোয়ারি, আবার সাধারণ-অসাধারণ মানুষের অবাধ চলাচল একই যাত্রায় ঘটে। সবচে বড় কথা, কেবল জীবনকে খুঁড়ে দেখা নয়, শিল্পকে খনন করতে করতে তিনি পৌঁছে যান এক অসীম নিরালোকে। শিল্পের স্ফুটনে সেখানে জন্ম নেয় এক অনাদায়ী বিশ্ব। সেই বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে করতেই আবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আর প্রতিটি কাহিনি এক নতুন মোড়কে নতুন আবেশে আচ্ছাদিত হয়। ‘ঋতুসংহারে জীবনানন্দ’ পাঠ এক বিস্ময়ের বেলাভূমিতে দাঁড় করায়।

‘ভারতবর্ষ’ : উপনিবেশ, ইতিহাস, মানুষ

‘ভারতবর্ষ’ লেখকের হাতে লেখা কেবল উপন্যাস নয়, উপন্যাসের আদলে নির্মিত মানুষের ইতিহাস। যে-উপনিবেশ তাদের শক্তিমত্তা, জ্ঞান-বুদ্ধির ফেরি নিয়ে দেশে দেশে ঘাঁটি তৈরি করেছিল। যদিও লেখকের এ-আখ্যানটি অসমাপ্ত কিন্তু এর মধ্যে ঔপনিবেশিক ভারত, বঙ্গের ইতিহাস, মর্মান্তিক ক্রীতদাস-ব্যবসা নিপুণভাবে উল্লিখিত। দুটো ভিন্ন প্লট আখ্যানটাতে একই সঙ্গে কাজ করে। খুব সচেতন না হলে এক প্লট থেকে অন্য প্লটে স্থানান্তরটা বোঝা মুশকিল। অতীত আর বর্তমান সেখানে মিশে একাকার। বর্তমান পৃথিবীর নারকীয় সন্ত্রাসবাদ দিয়েই আখ্যান আরম্ভ হয়। বরাবরের মতোই একটি গল্পের ঢঙে লেখক প্রবেশ করেন বৈচিত্র্যময় বয়ান-কৌশলে। সেই বয়ন আর বয়ানকৌশলে আখ্যান গতিপ্রাপ্ত হয় কালের ফসিল-অন্বেষণে।

উপন্যাসে ইতিহাস ব্যবহার করার নানা পদ্ধতি রয়েছে। শামীম রেজা কখনো স্মৃতিকথা, কখনো চিঠির আদল, কখনো দিনপঞ্জির ঢঙ ব্যবহার করেছেন। তবে এমনভাবে সেসব উপাদান গল্পের মধ্যে

পরিবেশিত হয়েছে যে, সেখান থেকে কোনো একক উপকরণকে আলাদা করা মুশকিল। একটি সুকৌশল গল্পভঙ্গিতে ঔপনিবেশকদের অমানবিক ইতিবৃত্ত তিনি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের বিশেষ বর্গটাকেও যেন এড়িয়ে গেছেন। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস মানেই তো রাজ-রাজড়াদের প্রতিষ্ঠিত গালগল্প। কিন্তু এ-আখ্যানে এক জটিল অস্থির আঞ্চলিক বা গ্রামীণ জীবনের সন্ধান মেলে। যা মাইক্রো-ইতিহাসপাঠের পথকেও উন্মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ নিম্নবর্গের নাম করে যে ধুয়াটা হাল আমলে উঠেছে, তার প্রধান বিষয় কিন্তু আমজনতার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস-সন্ধান। কথাকার শামীম রেজা সেই ছোট ছোট গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিবর্তন, সংবর্তন, সঙ্করায়ণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তবে গল্পের আমেজকে তিনি ধরে রাখেন বিশেষ কাহিনিকৌশলে। কোনো বানানো গল্পও নয়, দগদগে শরীর নিয়ে উপস্থিত মানবিক গল্প। সে গল্প হারিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প। সুলিমা সুলতানা, শিল্পাদেবী কিংবা এলফ্রেড শচীন ও তার বন্ধু কিংবা ফাদার ফ্রান্সেসকোও সেখানে ভিড় করে আছে। আরও আছেন চরিত্র হিসেবে শামসুদ্দীন, যিনি আসলে কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম। তিনি বরিশালের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। এছাড়াও রয়েছেন তপন রায়; মূলত যাঁর জবানিতে কাহিনি লেখা হয়। তাঁর কাছেই চিঠি লেখেন শামসুদ্দীন। তপন রায় চৌধুরীর পরিচয়—একজন বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ, যাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন বরিশালের প্রখ্যাত জমিদার।

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে নানামুনির নানা মত। সেসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ইতিহাসকে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ তাতে শিল্পটা মার খেয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও হয়তো রাজ-রাজরাদের কাহিনি-সমৃদ্ধ

আখ্যান রচনার কথাই প্রতিধ্বনিত। অন্যদিকে জর্জ লুকাচও এবিষয়ে তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনিও উপন্যাসের ইতিহাস আর বাস্তব ইতিহাসের ভেদরেখা তুলে ধরেছেন। উপন্যাস-পাঠের মধ্য দিয়ে যদি ইতিহাসের অনালোকিত বাসিন্দারা সামনে এসে উপস্থিত হয়, সেখানে উপন্যাস আপনিই মানুষের গল্প হয়ে ওঠে। কথাকার হিসেবে শামীম রেজার হয়তো সে-বিষয়টাই মাথায় ছিল। তিনি গভীর এক আঞ্চলিক দ্যোতনার ভেতর দিয়ে মানবিক ইতিহাসের চোরাগোপ্তা পথ আবিষ্কার করেছেন। দাসব্যবসা, দাসের ইতিহাস, পর্তুগিজ বাণিজ্য আর দস্যবৃত্তিতে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের আঞ্চলিক কাহিনি তো তেমনভাবে লেখা হয়নি। সীমিত আকারে ইতিহাসের বয়ান থাকলেও কাহিনি-আকারে জনজীবনের নিবিষ্ট অভিক্ষেপ তাতে অনুপস্থিত। কথাকার হিসেবে লেখক সেই অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে পাঠককে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ব্যবসা বা বাণিজ্যকুঠির পশ্চাতেও থাকে ভুলে যাওয়া নিরেট অমোঘ জীবন-ইতিহাস।

ঔপনিবেশিক আমলে প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণ ছিল না, বরং তা আসলে নিরেট ব্যবসাবৃত্তি। এরই একটা নগ্ন রূপ মিশনারির ধর্ম প্রচারের অধীনে পরিচালিত ক্রীতদাসত্বের অন্ধকার পরিবেশ। চোখে কালো কাপড় বেঁধে অন্ধকার রুমে বন্দি করে রাখা হতো মানুষকে। বিভিন্ন বন্দর থেকে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসা হতো। মূলত যারা প্রতিবাদী প্রতিরোধী, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। যেমন উপন্যাসে পাই,

> “তপন রায় তার বরিশালের লেখক বন্ধু শামসুদ্দিনকে প্যারিসে এক সাহিত্যের আড্ডায় ইয়ার্কির ছলে বলেছিলেন, এই শামসুদ্দিন, তোর প্রিয় মাস্টার মশাই জীবনানন্দ বাবুর পূর্বপুরুষদের এক পরিবারকে ফিরিঙ্গি আর মগরা ধরে নিয়ে গেছিল জানিস? আর এরই ফলে তারা এক ঘরে হইয়া পড়ে।”

তবে এর মধ্যেও কিছু মানুষ মানবতা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরই একজন আইরিশ পাদ্রী। সে নাম বদল করেছিল। উপন্যাসে আছে, 'কিভাবে আইরিশ পাদ্রী হয়ে তপন রায়, পরবর্তীতে শামসুদ্দিন কালামের হাতে এমন মূল্যবান ডায়েরির জেরক্স কপি এসে পৌঁছলো।' বস্তুত, 'পর্তুগিজ পাদ্রী মেস্ত্রো সেবাস্তিয়ান মানরিকের এই ডাইরি এখন এই অঞ্চলের মধ্যযুগের একমাত্র অন্ধকার অধ্যায়ের সাক্ষী, সত্য ইতিহাস।' তপন রায় চৌধুরী ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি পান মেনরিকের। যা থেকেই মূলত ভারতবর্ষের এই অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান মেলে।

আমরা সবাই জানি, ইতিহাস লেখা হয়েছে উপনিবেশকারীর চোখ দিয়ে। ফলে এদেশে আসা মিশনারি কিংবা উপনিবেশকারী নিজেদের মনগড়া ইতিহাস রচনা করেছে। এমনই একটি ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় যা, ঔপন্যাসিক তথ্যপূর্ণ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তুলে ধরেছেন। 'হ্যাকলুইট সোসাইটি' মিশনারির প্রয়োজনে তাদের সুবিধা মতো এমন ডায়েরির কিয়দংশ পর্তুগিজ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে। তপন রায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতার উপরে পড়াকালীন এই ডায়েরির সন্ধান পান।

এই ডায়েরি থেকেই উদ্ধার করা যায় এই উপমহাদেশে প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস, বিভিন্ন দেববংশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস। মগ আরাকান দিয়াঙ প্রভৃতি স্থান ও বন্দরের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। সেখান থেকে জানা যায়—খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন দেব বংশীয় রাজারা। যার নাম ছিল বর্ধমানপুর। পরবর্তীকালে আরাকানিরা অংশগ্রহণ করে।

সব জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু মহাপুরুষ জন্মায় গোপনে। তেমনি একজন ফাদার ফ্রান্সেসকো। স্বর্গীয় ফাদার ফ্রান্সেসকো ছিলেন মহান যীশুর প্রেরিত পুরুষ। তিনি শিশুদের স্নেহ করতেন। মা মেরির সন্তান হিসেবে ভালোবাসতেন। ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। এখানে ঔপনিবেশিকরা সন্দ্বীপের দখল দ্বন্দ্বে মগ (আরাকান) খ্রিস্টান পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গির্জায় আশ্রয় নেয়া এতিম শিশুদের সৈন্যরা ক্রীতদাস হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ফাদার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তখন তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে মগ সৈন্যরা।

কত কত ভালো মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরই একজন প্রতিবাদী যুবক। তার প্রতিরোধের কন্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে যায় উপনিবেশকারী কারও বন্ধু নয়। যুবকটির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে শক্তিসম্পন্ন এক মানবিক কন্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। যুবকটির বর্ণনা এবং প্রতিবাদী কন্ঠস্বর শোনা যাক,

> “যুবকটির মধ্যে সম্মোহনী শক্তি আছে। তাকে যতই যীশুর বাণী আদর্শের কথা শুনাই, সে ততই নিরব ও গম্ভীর হতে থাকে। ...যুবকটি শুধু এই কদিনে একবার ঝাঁঝালো উচ্চারণে বলেছিল, (আমি এলফ্রেডের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছি) আপনাদের দেশে কি কোন খাবার দাবার নাই। ডাকাতি কইরে খাবার আহরণ আর জোর করে ধর্ম জ্ঞান দান এটা কোন ধরনের কাম।”

বহু বছর আগে এ-উপমহাদেশের শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান প্রজ্ঞা সৌন্দর্য প্রকৃতি নানা কিছু বর্ণনা আমরা পেয়েছিলাম বিভিন্ন পর্যটকের হাতে। কিন্তু সেই দেশটি লুট হয়ে গেছে। উপনিবেশিক লুটপাটে তা নিজের শক্তি-সামর্থ্য হারিয়েছিল। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ বন্দরের

বর্ণনা ডায়েরির পাতা থেকে উদ্ধার করা যায়। সময়টা ছিল ১৩ মার্চ ১৬২৯,

> "এক আশ্চর্য দেশ। একদিনের মধ্যে কতবার সূর্য ওঠে, বৃষ্টি নামে আবার শীতের কাঁপন লাগে তা বলা মুশকিল। কি একটা বায়ু বয় যাতে ভীষণ বেগ থাকে। আরো মাস দুই পরে প্রবল বেগে বইবে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন বায়ুর কথা শুনিনি। তবে এখানে পাখির বিষ্ঠায় বৃক্ষ জন্মে। অর্থাৎ ফল খেয়ে বাগানে যে পয়োঃনির্গত করে তাতেই গাছগাছালি জন্মে! ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট দেশ। কত ধরনের হয় এ দক্ষিণের দ্বীপগুলোতে। এসব স্বর্গের নমুনা।"

সেবাস্তিয়ানের সে লেখা ডাইরিতে রয়েছে ক্রীতদাস বাজার জুইদন্ডির বর্ণনা। যেটি শঙ্খ নদীর মোহনা শিবপুরের কথা। বর্তমানে যা বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার শ্রীমন্ত নদীপাড়ে অবস্থিত। সেখানেই নেটিভ ব্রাদার হিসেবে সেবাশ্রমে কাজ করার জন্য নিয়োগ পেয়েছিলেন এলফ্রেড শচীন। তার লেখা স্মৃতিকথা ছাড়া অন্ধকার জগতকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তার মৃত্যুর পরে জীর্ণ একটা সুরকি গাঁথা কোঠায় 'স্মৃতিকথা' ছেঁড়াখোঁড়া খাতার মধ্যে লাল কাপড় দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। শ্রীমন্ত নদী নিজস্ব গর্ভে সেবাশ্রমটি নিয়ে গেছে। সেই স্মৃতিকথার পোকায় খাওয়া হস্তলিপির অমূল্যপান্ডুলিপি বাটাজোরের এক হিন্দু রাজার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। এ যেন গুপ্তধনের পৌরাণিক বাক্স। সেখানে কিংবদন্তির মতো কাহিনি, শীলাদেবীর হৃদয় মহল, ক্রীতদাস ব্যবসা, পর্তুগিজ জাহাজের খোলের ভেতরে পূর্বপুরুষের আর্তনাদ ও নগ্ন চিত্রের কথকতা।

এর মাঝখান দিয়ে ঔপনিবেশিক কাহিনির ভেতরে ভেতরে স্থানীয় নদী, জনজীবন, নদীপাড়ের মানুষের জীবিকা ও নির্মম জীবনের সাক্ষী পাওয়া যায়। প্রকৃতির খেয়াল আর নদীর গতি পাল্টানোর

মতই বিচিত্র সে-ইতিহাস। স্থানীয় মানুষদের ভেতর থেকেও একটা ইতিহাসের রেখা ফুটে ওঠে। সেখানেও দেখা যায়, তাদের জীবন-নির্মাণের পেছনে ঔপনিবেশিকদের হাত আছে। বাঘাই নদীর পাড়ে মানুষের বৃত্তান্ত শুনতে গিয়ে ধরা পড়ে সেই জ্বলজ্বলে স্মৃতি। উত্তরা বরযাত্রীদের নৌকা এক বছর ধরে আটক রাখা হয়। তাদেরকে দিয়ে দীঘি খনন, মসজিদ তৈরি থেকে শুরু করে কঠিন কঠিন কাজ করায়। কেউ কেউ সেখানে রয়ে যায়, কোনদিন আর গ্রামে ফেরেনি। তারা ছিল তুর্কমেনিস্তান কিংবা আফগান পাঠান বংশের। যারা একাধিক বিয়ে করে সমাজে সম্মান বাড়াত। বাঘাই নদীর পাড় থেকে আগুনমুহা পাড়ে বাস করার ইতিহাসের পেছনে এরই বাস্তবতা। যে ইতিহাস বলে, এদেরই একজন সগিরুদ্দি খাঁ। তিনি ফার্সি থেকে ‘ইউসুফ জুলেখা’ রচনার কিয়দংশ বাংলা পয়ারে অনুবাদ করেছিলেন। তার দাদার দাদা দুই হাজারি সৈন্যের সেনানায়ক ছিলেন। গৌড়ের পাঠান সুলতান বাহাদুর শাহর অধীনে কাজ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছেলে চট্টগ্রামে ত্রিপুরা রাজ্যের সেনাপতি নিয়োজিত হন।

উপন্যাসের বর্ণনাতেই আমরা খুঁজে পাই, ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে আরাকানীদের যুদ্ধ। হার্মাদরা আরাকানীদের সাহায্য করে। সেই পাঠান বংশের সন্তান খাঁ-দের আজ বেহাল অবস্থা। সেই ‘ইউসুফ জুলেখা’র পাণ্ডুলিপি লেখক অকৃতদার সগীরুদ্দি খাঁ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন, সারারাত পালাগান করতেন উরসে। পরবের দিন হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোকসমাগম ঘটত। কবির লড়াই, সোহরাব রুস্তম এর কাহিনি, কারবালার ঘটনা, ইউসুফ জুলেখার পুথি পড়ে শুরু করতে বলা হতো লড়াই। অন্যদিকে রামায়ণ-মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করত একদল কবি। এসবের মাহাত্ম্য—জীবনের নানাদিক বাঙময় হয়ে উঠত।

বস্তুত এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চিত্রময় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মেলায়-পার্বণে মানুষ একসঙ্গে উৎসব পালন করতো। মেলাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দুর্গা কালী গণেশের মূর্তি যেমন কিনতো, তেমনি মুসলমানরা বিসমিল্লাহ আল্লাহ তাজিয়ার ঘোড়া আরবিতে লেখা এসব কিনতো। সব সম্প্রদায়ের লোক এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করত।

উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে প্রেম জীবন নারীর সৌন্দর্য। একজন শিল্পাদেবী জুলেখার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মনে পড়িয়ে দেয় রাধা কিংবা দ্রৌপদীর কথা। শিল্পার শরীর থেকে যে সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসে, তার বর্ণনা যেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও নেই। প্রথম শরীরের স্পর্শে কাঁপন ধরেছিল, আনন্দধারা বয়ে গিয়েছিল। তাদের ঠোঁটের মিলনে স্বয়ং যেন ঈশ্বর এসেছিল। এসব কথা শচীনের স্মৃতিকথায় লেখা রয়েছে। তারপর রয়েছে চন্দননগরে পৌঁছে ভীষণ ক্লান্ত দেহ। শচীনের লেখা শিল্পার প্রেমকাহিনি উপন্যাসকেও হার মানায়। একসময় তাদেরকে চারজন প্রহরী হাত-পা বেঁধে পিপলি বন্দরে উড়িষ্যায় পর্তুগিজদের পর্ণকুটিরে পাঠায়। এই পিপলি বন্দরের কথা উল্লেখ আছে শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' রচনায়। সেখানে অবশ্য পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নতা রয়েছে। চন্দননগর থেকে বাকলায় ফিরে বাড়ি অভিমুখে যাত্রার পথে বিষখালী পাড়ে শচীন শিল্পাদেবীর খবরা-খবর জানতে তাদের এলাকায় প্রবেশ করে। শচীনদের বাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের তীর্থস্থান পোনাবালিয়া গ্রামের শ্যামরাইলের শিববাড়ি। এখানকার শিবলিঙ্গ 'এম্বকেশ্বর শিব' নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হতো, যার পাশ দিয়ে সুগন্ধা নদী প্রবাহিত, যা বর্তমানে ঝালকাঠি। লক্ষণ সেনের বংশধরদের মধ্যে যারা মুসলমান ভয়ে পলায়ন করে বাকলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদেরই জ্ঞাতিদের উত্তরসূরী শিল্পার

প্রেমিক শচীনের বন্ধু। নিজেকে যখন সে চন্দননগরের চিতার পাশে আবিষ্কার করেছিল তখন শিল্পা দেবীর মৃত্যু হয়ে গেছে।

এর কয়েক মাস পর শচীন তার বাবা-মাকে নিয়ে মামা বাড়ির উদ্দেশ্যে পানসি নৌকায় রওনা হলে পর্তুগিজ হার্মাদ দস্যুদের কবলে পড়ে। এরা শুনেছে, কখনো দেখেনি দস্যুদের কার্যকলাপ। ভেবেছিলো, মায়ের স্বর্ণালংকার নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু নওগাঁ থেকে বন্দুক আর উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বাবা উত্তেজিত হয়ে একজনকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে গুলি করা হয়। এদিকে জাহাজ থেকে মানব-মানবীর কান্নার রোলে দিগন্ত বিদীর্ণ হয়ে ওঠে। এলফ্রেড শচীন এভাবেই তার স্মৃতিকথায় জীবনকাহিনি লিখে যায়। ইতিহাসের কিছু ফুটনোটও তিনি দিয়েছেন, যেমন উড়িষ্যার পিপলি বন্দরে পর্তুগিজরা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে ১৫১৪ সালে। সেখান থেকেই তারা মেদিনীপুরের হিলি বন্দরে ১৫১৭ সনে জোয়াও দ্য সিলভিয়ার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেঁধে যায়। চট্টগ্রামে বাণিজ্যের অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় বাণিজ্যতরী লুট করে তারা। এভাবেই এদেশের বাণিজ্য বিপর্যয় ঘটে। তারা প্রতি বছর অন্তত একবার বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রামে আসতো। প্রচুর অপকর্মের পরেও তারা এ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছাড়েনি। পর্তুগিজ গভর্নর নুনো দ্য কুনহা অনবরত চেষ্টা চালাচ্ছিলেন চট্টগ্রামে বাণিজ্য অধিকার লাভের জন্য। ভাস্কোদাগামা যেমন কালিকট বন্দরে জেলেদের বেঁধে বাণিজ্য সুবিধা আদায় করেছিলেন, পূর্ব বাংলার বেলায়ও তাই ঘটল। আরো জানা যায়, ১৫২৮ সালে পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন আফানসো দ্য মেলোর জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে ভেঙে যায়। চট্টগ্রামের শাসক খোদাবক্স মেলকে বন্দি করে। গোয়ার পর্তুগিজ শাসনকর্তা সংবাদ পেয়ে গৌড়ের দরবারে খাজা শাহাব উদ্দিনকে দূত

করে পাঠান ৩০০০ ‘কুজুওডুস’ পর্তুগিজ মুদ্রা মুক্তিপণ দিয়ে। এরপর আরো অনেক ঘটনা ঘটে। তবে গৌড়ের রাজা তাদেরকে কখনোই বাণিজ্য সুবিধা দেয়নি। স্থানীয় বহু লোককে পর্তুগিজরা বন্দি করে নিয়ে যায় গোয়ায়।

শচীনের স্মৃতিকথায় পর্তুগিজ-আক্রান্ত এদেশের মর্মান্তিক ইতিহাসের সন্ধান মেলে। ইতিহাসের সাক্ষী সুলতানা নাজমা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৌরবর্ণ মেয়েটি জুইদন্ডির পৃথিবী বাজারে পাওয়া গিয়েছিল। এই মেয়েটিকে তারা নানাভাবে অত্যাচার করে। বণিকের বেশে আসা ব্যক্তিরা স্তন যোনিদ্বার পরীক্ষা করে যুবতী সুলতানাকে জাহাজ দিকে টেনে নিয়ে যায়। উপন্যাসিকের ভাষায়,

> “কোন যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় সে, শকুনির পরাজিত হয়ে ক্রীতদাস হয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে পণ্ডিত মশাই পয়ারে বলতেন, ‘দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্যা তার’/ দাস ভাগ্যা দাসী হয় বিদিত সংসার ।।/ দাসী হৈলি দাসী কর্ম-কর যথোচিত।”

৩১ শে মার্চ আরাকান প্রসঙ্গে লেখা ডায়েরিতে মোগল রমণী সুলিমা সুলতানাই এই সুলতানা নাজমা। ক্যাপ্টেনের সেকেন্ড ইন কমান্ড লেফটেন্যান্ট ফ্রেডরিক সাইন-এর তাঁবুতে আলফ্রেডকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছানো হল। সেখানে যে ভদ্রমহিলা আছেন, তার নাম সেবন্তী সেন। রাজা লক্ষণ সেন যখন মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, দক্ষিণাঞ্চলে, তাদের আত্মীয় পরিজন কেউ কেউ বাকলার বিভিন্ন দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। রমণী দেখতে রোমানদের উত্তরসূরী সন্তানের মত। জানা যায়, মোগল রমণী সুলিমা সুলতানা আর রাজবংশীয় কন্যা সেবন্তী সেনকে নিয়ে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে মগ আর পর্তুগিজদের মধ্যে। এদিকে ক্যাপ্টেনের আশ্রয়ে থাকা

সুলিমা ফাদার সেবাস্তিয়ানকে অনেক গোপন কথা বলেন। তার স্বামী দিল্লির সম্রাটের বন্ধু, কিন্তু জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। কিন্তু সেবাস্তিয়ান তাকে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বর্ষার একরাতে ক্যাপ্টেন সুলিমা সুলতানাকে জোর করে নিয়ে যায়। সুলিমা সবই বুঝতে পারে। তাই মসলিন কাপড় আর অন্তর্বাস খুলে ক্যাপ্টেনকে আহ্বান করে। কিন্তু ঈশ্বর যেন নিজে হাতে তৈরি করেছে এ-রমণীকে। সে প্রচণ্ড শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কামার্ত ক্যাপ্টেন তাকে ভোগ করতে গেলে সুলিমা দাঁত দিয়ে তার জিহ্বা কেটে ফেলে, আদর করার ছলে ডান হাত দিয়ে অণ্ডকোষ চেপে ধরে। ক্যাপ্টেন ধাতস্থ হবার পূর্বেই তার লিঙ্গ কেটে ফেলে ছুরি দিয়ে। দুর্গের পাহারায় থাকা পর্তুগিজ দস্যুরা তাকে বন্দি করে। ক্যাপ্টেন মারা গেলে গির্জার পাশে কবর দেয়া হয়। আর ফাদার সেবাস্তিয়ান সুলিমাকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন তার সেবাশ্রমে।

এরপর একটা চিঠি আসে তপন রায়ের কাছে। তার আগেই জেনে নেই, হিজলি বন্দরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া সেই মানুষ এলফ্রেডের সাক্ষাৎ মেলেনি। আরবি ফারসির পণ্ডিত হিসেবে গোয়ায় গভর্নরের যুদ্ধে দূতিয়ালির কাজ করেছে সে দীর্ঘ দিন। এরইমধ্যে শামসুদ্দিন তার বন্ধু তপন রায়কে ডায়েরির কিছু অংশ অনুবাদ করে পাঠায়। এ-অনুবাদের সঙ্গে যে চিঠি পাঠায় তার সঙ্গে আজকের চট্টগ্রামের বিখ্যাত পরিবারের বংশ-পরম্পরার ইতিহাস লক্ষণীয়। তপনের কাছে লেখা চিঠিতে রয়েছে সন্দ্বীপের কথা, সত্তরের দশকের এক প্রাচীন দ্বীপ, যেখানে কুচ্ছা সম্প্রদায়ের মুসলিম বাস করে। তাদের পেশা সমুদ্রে মৎস্য শিকার, রাতে ডাকাতি করা। জানা যায়, ১৬০২ সালে বাকলার রাজা কেদারা-এর পক্ষ নিয়ে কার্ডালহো নামের পর্তুগিজ দস্যু সন্দীপ দখল করে। এরপর

অনেক ঘটনার পর ১৬০৯ সালে মোট ১০ বছর গঞ্জালেস টিবা সন্দ্বীপের অধিকর্তা হন। এরপর আরাকান রাজ্যের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যান। এসময় তিনি গোয়া দিয়াঙ হুগলি কিংবা লিসবনের রাজাকেও পরোয়া করতেন না। এই দশ বছরে সন্দ্বীপে স্থানীয়দের সংস্পর্শে প্রভূত শংকর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেখা যায়। এদেরই বংশোদ্ভূত সম্প্রদায় রাজনৈতিক সুবিধার কারণে মুসলমান হয় পরবর্তীকালে। শামসুদ্দিনের চিঠিতে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এখানকার ঘটনার। এরপর ২৬ মার্চ ১৬২৯ আরাকানের দিয়াঙের একটা বর্ণনা ডায়েরির পাতা থেকে উল্লেখযোগ্য,

> "মুসলিমরা ১৪৯২ সালে বিতাড়িত হয় স্পেন থেকে। আর আমাদের পূর্বপুরুষরা দৃশ্যমান সুদূরের ডাকে দিগ্বিদিক মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে চলল। চোখে ছিল আনন্দ দিনের স্বপ্ন, বুকে হিম্মত। মাটি যাদের পায়ের নিচে, সমুদ্র দাঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, বাতাস আটকে গেছে আমাদের পালে, আকাশ যেন ঈশ্বরের ছাতা। আরব আর পারস্যের নাম নিশানা রাখবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যীশুর এই বান্দারা। নীল সমুদ্রে সমুদ্রে শুধু তাদের জাহাজ ছাড়া কেউ তুলবে না। সাত-সমুদ্র শুধু আমাদের, আমরা মহান যীশুর কৃপায় সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করবো। ঈশ্বর মঙ্গল করুক। আজ অঙ্গার খেল থেকে প্রায় ১০০ জনকে নিয়ে এসেছি, এর দীক্ষা দেবে বলে শিকার গেছে। সবই ঈশ্বরের কৃপা। "

বস্তুত অসমাপ্ত এই আখ্যানে কথাসাহিত্যিক হিসেবে শামীম রেজা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাংলার ইতিহাস, উপমহাদেশীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মনে হয়, অনেক তথ্য নথি ঘেঁটে সত্য ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান কালের অভিক্ষেপও আখ্যানটিতে অন্যমাত্রা নিয়ে উপস্থিত। নিদাঘ

বর্তমানে প্রগতিবাদী মানুষ সবসময়ই হুমকির সম্মুখিন। এখানে কল্পনার চেয়ে বাস্তব অধিকতর জ্বলজ্বলে। অন্যদিকে বাংলার গ্রাম-সংস্কৃত মানুষের গভীর এক ইতিহাসের দলিল ‘ভারত বর্ষ’। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত দিয়ে অত্যাচারিত ভূমি, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনযাপন, এমনকি গ্রাম, নদীপাড়, নদীর ইতিহাস—সুদক্ষ জীবনদৃষ্টিতে অঙ্কিত। মানুষের অমানবিকতার সাংঘাতিক নমুনা ঔপনিবেশিক ইতিহাস। স্বাভাবিক জীবনকে যা পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। বাংলা উপন্যাসে বা আখ্যানগুলোতে ম্যাক্রো-ইতিহাসের বহু বর্ণনা আমরা পেয়েছি। কিন্তু মাইক্রো-ইতিহাসের অনন্যতা নিয়ে আখ্যানশরীর সংযোজন অপ্রতুল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাই ঔপনিবেশিক বেনিয়াবৃত্তি, অত্যাচার, মানবিক স্খলন-এর এমন দগদগে ইতিহাস-ঋদ্ধ কাহিনি বিরল। এ-কাহিনির মধ্য দিয়ে উপনিবেশের সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাস, সেই পর্তুগিজদের থেকে আজকের বাংলা অঞ্চলের গ্রাম, এমনকি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে অনু-ইতিহাসের ধারাবাহিকতা শৈল্পিক তুলির আঁচড়ে চিত্রময় হয়ে উঠেছে।

---

*খোরশেদ আলম, শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।